৯. শকুনির ডিম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পড়ুয়ারা গল্পটি পড়ে নিজের ভাষায় বলতে পারবে। এই রচনাটি পড়ে তারা মূল বিষয়টি বুঝতে পারবে, সেটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবং নিজের বক্তব্য বলতে পারবে।

পাখির মতো আকাশে ওড়ার ইচ্ছে তো মানুষের সেই কতদিনের। কেবল, কীভাবে ওড়া যাবে সেটাই ছিল ভাবনা। আর সেই ভাবনা থেকেই এরোপ্লেন আবিষ্কার করে মানুষ একদিন আকাশে উড়ল। অপু যেভাবে উড়তে চেয়েছে সেটা ভুল হলেও তার ওড়ার ইচ্ছেটা খুবই স্বাভাবিক। ওইরকম ইচ্ছে তোমাদের হয় না?

সেদিন দুপুরবেলা বাবার অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করে অপু চুপি চুপি তাঁর বইয়ের বাক্সটা লুকিয়ে খুলল। একখানা বইয়ের মলাট খুলে দেখল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই মলাট— নানা জায়গায় চটা উঠে গেছে। অপু বইখানা নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিল, কেমন পুরানো-পুরানো গন্ধ! এইরকম পুরানো বইয়ের উপরই তার প্রধান মোহ। সেইজন্যই সে বইখানা বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে অন্যান্য বই তুলে বাক্সে বন্ধ করে দিল।

লুকিয়ে পড়তে পড়তে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়ল বড়ো অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনলে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায় বটে— কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ-কথা লেখা আছে, সে পড়ে দেখল। পারদের গুণ বর্ণনা করতে করতে লেখক লিখেছেন,— শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরে কয়েকদিন রোদে রাখতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরে মানুষ ইচ্ছে করলে শূন্যমার্গে যেমন ইচ্ছে বিচরণ করতে পারে!

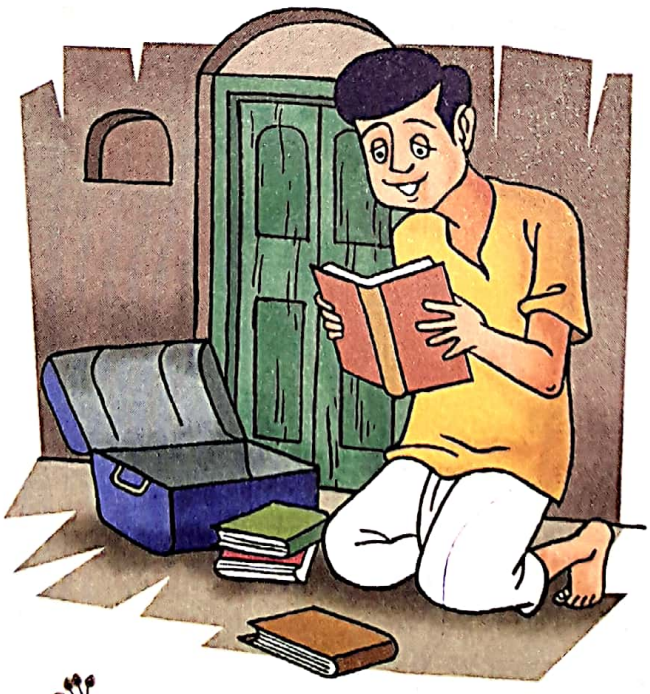

অপু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না,—আবার পড়ল—আবার পড়ল। পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকিয়ে রেখে বাইরে গিয়ে কথাটা ভাবতে ভাবতে সে অবাক হয়ে গেল।

দিদিকে জিজ্ঞেস করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি? তার দিদি বলতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীপু, কিনু, পটল,

Scanned with CamScanner

নেড়া—সকলকে জিজ্ঞেস করে! কেউ বলে—সে এখানে নয়, উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়! তার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস। অপু ঘরে ঢুকে শোবার ভান করে ও বইখানা খুলে সেই জায়গাটা আবার পড়ে দেখে। আশ্চর্য! এত সহজে উড়বার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কারও বাড়ি নেই, শুধু তার বাবারই আছে, হয়তো এই জায়গাটা আর কেউ পড়ে দেখেনি, শুধু তারই চোখে পড়েছে এতদিনে।

পারদের জন্য ভাবনা নেই— পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পিছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়িতে আছে, সেটা সে জোগাড় করতে পারবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় কী করে পায়?

সন্ধান অবশেষে মিলল। হীরু নাপিতের কাঁঠাল-তলায় রাখালরা গরু বেঁধে গৃহস্থের বাড়িতে তেল-তামাক আনতে যায়। অপু গিয়ে তাদের পাড়ার রাখালকে বলল— তোরা কত মাঠে-মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখতে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস, আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাদের বাড়ির সামনে এসে তাকে ডেকে কোমরের থলি থেকে দুটো কালো রঙের ছোটো-ছোটো ডিম বের করে বলল—এই দ্যাখো ঠাকুর, এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলল—দেখি! পরে আহ্লাদের সঙ্গে নেড়েচেড়ে বলল—শকুনির ডিম!—ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি-ভুরি প্রমাণ উত্থাপন করল। এটা শকুনির ডিম কিনা এ-সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই সে নিজের জীবন বিপন্ন করে কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল থেকে এটা সংগ্রহ করে এনেছে কিন্তু দুটি দু'আনার কমে দেবে না।

পারিশ্রমিক শুনে অপু অন্ধকার দেখল। বলল—দুটো পয়সা দেব, আর আমার কড়িগুলো নিবি সব দিয়ে দেবো, একটা টিনের কৌটো ভর্তি সব।

রাখাল নগদ পয়সা ছাড়া রাজি হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর এসে চার পয়সায় দাঁড়াল। অ দিদির কাছে চেয়ে-চিন্তে আর দুটি পয়সা জোগাড় করে দাম চুকিয়ে ডিম দুটি নিল।

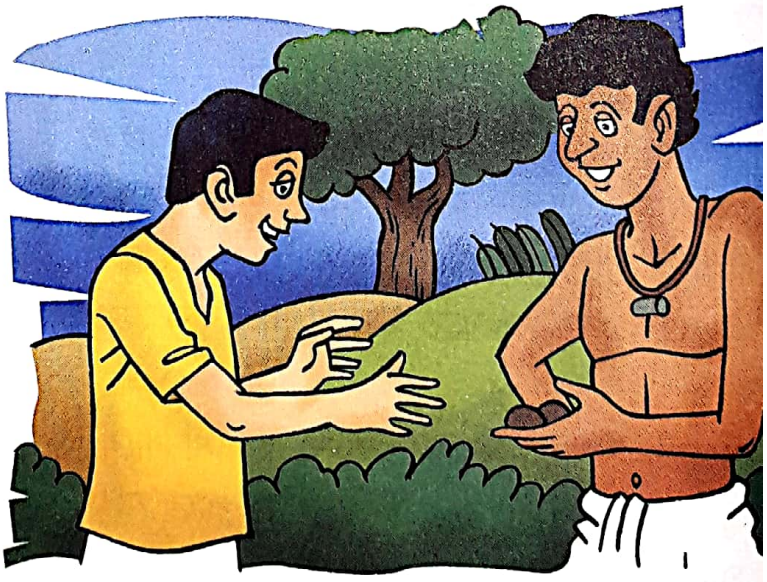

ডিমটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মতো হালকা হয়ে ফুলে উঠল। তারপর যেন একটু সন্দেহের ছায়া তার মনে এসে পৌঁছল। সন্ধ্যার আগে একা-একা নেড়াদের আমগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসে সে ভাবতে লাগল— সত্যি সত্যি ওড়া যাবে ত! আচ্ছা সে উড়ে কোথায় যাবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছে, সেখানে?

Scanned with CamScanner

নদীর ওপারে? শালিখ পাখি ময়না পাখির মতো ও-ই আকাশের গায়ে তারা যেখানে উঠেছে ওখানে!

সেইদিনই, কি তার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলতে পাকাবার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসির পাশে গোঁজা ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরোর তাল হাতড়ে-হাতড়ে কী যেন ঠক্ করে তার পিছন থেকে গড়িয়ে মেজের ওপর পড়ে গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না— দুর্গা মেজে থেকে উঠিয়ে নিয়ে বাইরে এসে বলল—ওমা, কীসের দুটো বড়ো বড়ো ডিম এখানে! এঃ, পড়ে একবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে— দেখেচো কী পাখি ডিম পেড়েছে ঘরের মধ্যে মা!

তার পর কী ঘটল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সমস্ত দিন খেলো না। রুদ্রমূর্তি, কান্নাকাটি— হৈ হৈ কাণ্ড। তার মা ঘাটে গল্প করে— ছেলেটার যে কী কাণ্ড! ওমা, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে? ওই ওদের বাড়ির রাখাল ছোঁড়াটা— তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কীসের ডিম এনে বলেচে— এই নাও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কী বোকা, সে আর কী বলবো! কী করি যে এ-ছেলে নিয়ে আমি।

কিন্তু বেচারি সর্বজয়া কী করে জানবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়েনি, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহলে ত সকলেই উড়ত!

জেনে রাখ

অল্প কথায়/যিনি লিখেছেন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর, মুরাতিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে। শৈশব থেকেই পল্লি-প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই পথের পাঁচালী। অন্যান্য কয়েকটি রচনা: অপরাজিত, আরণ্যক, ইছামতী, আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রভৃতি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন, বনে পাহাড়ে, মরণের ডঙ্কা বাজে, হীরা মানিক জ্বলে, চাঁদের পাহাড়। ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এই লেখাটি পথের পাঁচালী উপন্যাস থেকে নেওয়া। সাধুভাষা বদলে চলিত ভাষা করা হয়েছে।

একটি কথা মনে রেখ

মানুষের মুখের কথায়, অনেক সময় 'ছ' অক্ষরটির উচ্চারণ 'চ' হয়ে যায়। এই গল্পে তোমরা দেখবে অনেক জায়গায় 'এনেচি', 'দেখেচো', 'গিয়েচে' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। কথ্য ভাষায় এমন হয়। তোমরা কিন্তু লেখার সময় 'এনেছি', 'দেখেছো', 'গিয়েছে' লিখবে।

Scanned with CamScanner